IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

On the Premises of Creation of Fictionist Pratibha Bose.

Dr. Sarmistha Acharyya
Assistant Professor, Department of Bengali,
Sindri College, Sindri, Dhanbad, Jharkhand, India.

Abstract:

An unforgettable star in the world of modern Bengali fiction is Pratibha Bose. The pen of the self-promotional yet strong self-confessed writer effortlessly captures the picture of the low-class, middle-class lifestyle. She has also shown the happiness and sorrow of the neglected, oppressed women. Non-Aryans lady has placed the character Draupadi of Mahabharata next to Non-Aryans, black girls. Her pen did not stop only doing on sketch of daily life. The oil painting of memory on the canvas of heart while traveling abroad with her husband has been used in her travel literature. There will be an opportunity to find the uniqueness of her creation in the main article under discussion.

Index words: 'Swadharma', thought-consciousness, sense of life, religion and non-religion, non-Aryans, feminist, independent.

শিরোনাম: কথাসাহিত্যিক প্রতিভা বসুর সৃষ্টির প্রাঙ্গণে

ড: শর্মিষ্ঠা আচার্য
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
সিন্দ্রী কলেজ, সিন্দ্রী, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

সংক্ষিপ্তসার:

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এক অবিস্মরণীয় নক্ষত্র হলেন প্রতিভা বসু। আত্মপ্রচারে কুন্ঠিত অথচ আত্ম প্রত্যয়ে সুদৃঢ় লেখিকার কলমে অনায়াসেই ধরা পড়েছে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেনির করুন জীবনযাত্রার ছবি। পাশাপাশি তুলে ধরেছেন অবহেলিত, অত্যাচারিত নারীর সুখ-দুঃখের চিত্র। মহাভারতের দৌপদীকে দাঁড় করিয়েছেন অনার্য কালো মেয়েদের পাশে। শুধু মাত্র দৈনন্দিন জীবন যাপনেই থেমে যায়নি তাঁর কলম; স্বামীর সাথে বিদেশ ভ্রমণের সময় হৃদয়ের ক্যানভাসে স্মৃতির যে তৈলচিত্র এঁকে নিয়েছিলেন তাকেই উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে। আলোচ্য মূল প্রবন্ধে তাঁর সৃষ্টির স্বতন্ত্রতাকেই খুঁজে দেখার অবকাশ থাকবে।

সূচক শব্দ: স্বধর্ম, চিন্তা-চেতনা, জীবন বোধ, ধর্ম ও অধর্ম, অনার্য, ফেমিনিস্ট, স্বতন্ত্র।

মূল প্রবন্ধঃ

একজন সাহিত্যিক তিনি তাঁর নিজস্বতা দিয়ে সাহিত্যের ভুবনকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন এটাই তাঁর স্বধর্ম। তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রকাশ, অজস্র অনুভূতির ছোঁয়া স্রষ্টার মনে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সেই সব প্রতিক্রিয়ার তাড়নাতেই শিল্পী তাঁর শিল্প সাধনায় এগিয়ে আসেন। প্রতিটি মানব সমাজেই এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা যুগের সৃষ্টি না হয়ে হন যুগস্রষ্টা। তাঁদের জিজ্ঞাসু মন, চেতনার বিশ্ব, সংবেদনশীল হৃদয় এবং অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা মানব সভ্যতাকে 'চরৈবতি' মন্ত্রে দীক্ষা দেয়।বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধারায় এরকমই একজন সাহিত্য প্রতিভা হলেন প্রতিভা বসু। তিনি জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছেও তাঁর সৃষ্টির ডালি উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর অনুরাগীদের। বহু ঘটনাকীর্ন ছিল তাঁর জীবন। জীবন সায়াহ্নে এসে জীবনের সঞ্চিত সোনার ধান তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে। তাঁর 'জীবনের জলছবি', 'ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে', 'স্মৃতি সততই সুখের', 'মহাভারতের মহারন্যে'র মতো মূল্যবান সাহিত্য। প্রতিভা বসুর এই সব রচনার সাহিত্যমূল্য কতখানি তা বিচার করে সমালোচক সোমেন বসু তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থে বলেছেন---

> "বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর মূল কথা হলো জীবন ব্যাখ্যা। সুতরাং আত্মজীবনীর সবটা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না। জীবনীর বৃত্তান্তের ভার কমিয়ে অন্তর্লোকের যে রহস্যের ব্যাখ্যা স্রষ্টারা করে থাকেন তাকে অনেকটা বুঝে নিতে হয় নিজের বোধ দিয়ে, নিজের অনুভূতি দিয়ে। আত্মজীবনী ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনী। চেতনার জাগরণ আর বিকাশই হল আত্মজীবনী বলবার কথা।"১

প্রতিভা বসু নিজের জীবনকথাকে ছোট ছোট গল্পের মত করে পরিবেশন করে পাঠক মনকে শুধু আনন্দই দেননি, জীবনের সাথে জড়ানো নানান অজানা কথা তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু (১৯১৫-২০০৬) পর্যন্ত প্রায় ৯১ বছরের জীবন ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সমকালীন আলোড়নের মধ্য দিয়ে নিজের মানস বিবর্তনের ধারাটি ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা আলোকপাত করব তাঁর এই সার্থক আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ নিয়ে যা শুধু বিষয়ে নয়, রচনাভঙ্গি বা প্রকাশভঙ্গিতেও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলা সাহিত্যে তার স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে।প্রতিভা বসুর জীবন প্রকৃত অর্থেই সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবনবোধে সমৃদ্ধ। আর তাই তিনি বলেছেন---

> "সুখ সত্যিই কৃপণ। ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়, আর আসে না। আমরা গাছের মতো পুরানো হই না, বস্তুর মতো পুরনো হই। গাছের আমৃত্যু প্রয়োজন ফুরায়না, আমাদের মনুষ্যকুলের প্রয়োজন সন্তান বড়ো হলেই মিটে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই মলিন কিরণ নিয়েই আমরা প্রয়োজনের পরেও বেঁচে থাকি। তারপর শুধু স্মৃতি, স্মৃতি আর স্মৃতি।"২

সুখ-দুঃখের এই পুঞ্জিভূত স্মৃতিকে নিয়েই প্রতিভা বসুর 'স্মৃতি সততই সুখের' প্রথম পর্ব (১৯৮০) ও দ্বিতীয় পর্ব (১৯৮৩), 'জীবনের জলছবি' (১৯৯৩) ফুটে উঠেছে। যাঁদের জীবনস্মৃতি শুধু তাঁদের জীবনেরই কথা নয়; একইসঙ্গে সেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আরও বহু বর্ণময় জীবনের কিছু কিছু অজানা কথা থাকে, প্রতিভা বসুর শিল্পেও সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার হাঁসাড়া গ্রামে ১৯১৫ সালের ১৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার দোল পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন আশুতোষ সোম ও সরযূবালা দেবীর একমাত্র কন্যা প্রতিভা বসু জন্মগ্রহণ করে। ডাকনাম রানু হলেও কেউ কেউ রানী বলেও ডাকতেন। পিতা-মাতার একমাত্র আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। যদিও প্রতিভা বসু নাগরিক জীবনের রূপকার, তথাপি তার জন্মস্থান হাঁসাড়া গ্রামের প্রাকৃতিক বর্ণনা পাই---

> "জলের গ্রাম। এ বাড়ি ও বাড়ি সব থাল দিয়ে ঘেরা। নৌকা ছাড়া কোথাও যাবার উপায় নেই। যেমন শহরে অর্থবান লোকদের গাড়ি থাকে তেমনি সেই গ্রামেও অর্থবান লোকদের নৌকা থাকতো।"৩

প্রতিভা বসুর কলমে মহিমায় গত শতকের বাংলার সাংস্কৃতি জগতের খ্যাতিমান সব প্রতিভারা জীবনের এক বিরাট ক্যানভাসে নানা রঙে রঙিন হয়ে ফুটে উঠেছেন। তাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতিভা বসুর জীবনের বহু

দ্যুতিময় মুহূর্তের ছবি। যে আন্তরিকতার সঙ্গে একের পর এক ছবি তিনি কলমের মহিমায় তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর জীবনের ধারাভাষ্যকে যেমন অন্তরঙ্গ তেমনই চিত্তগ্রাহী করেছে। কত বিখ্যাত বর্ণময় চরিত্রকে একেবারে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে এঁকেছেন, সহৃদয় পাঠকেরা যেন তাঁদের ছুঁতে পারেন।

১৯৩৪ সালের ২৯ জুলাই রানু সোমের সঙ্গে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর পদবী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাণুর পারিপার্শ্বিক জগতের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। পরিবর্তন হয়ে যায় তাঁর ভাবনা চিন্তাও। তাঁর জীবন স্রোতস্বিনীর ধারা এইখানে এসে আশ্চর্যজনক এবং ঐতিহাসিক মোড় নেয়। তিনি চলার গতিপথও পরিবর্তন করেন। জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রাণু সোম জীবনের এই বাঁকে এসে সংগীত ক্ষেত্রকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠা করেন। গায়িকা রাণু সোম সঙ্গীত জগতকে পাশ কাটিয়ে হয়ে উঠলেন সাহিত্যিক প্রতিভা বসু। জীবনসঙ্গী বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে প্রতিভা বসুর অনন্য স্বীকারোক্তি---

> "এই তিনটি দেবতুল্য মানুষ আমাকে যে স্নেহের সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নির্মল আশীর্বাদেই বুদ্ধদেব বসু নামের লেখকটির সঙ্গে আমার অতি শুভক্ষনে দেখা হয়েছিল। সম্পূর্ণ চল্লিশ বছর আমি তাঁর সঙ্গে বসবাস করেছি, এমন কথা আমি কখনোই বলতে পারবো না, তিনি আমাকে কখনও কোন কারণে অসম্মান করেছেন, অশ্রদ্ধা করেছেন...তিনটি সন্তান বিষয়ে বুদ্ধদেবের মনোযোগ অব্যাহত থেকেছে। আমি থেকেছি রানির মতো। "৪

বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসুর ভাবনা চিন্তার অন্যরূপ লক্ষ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন-

> ".... তার প্রকৃতিদত্ত সুকন্ঠ ও সুরজ্ঞান সত্ত্বেও তার আসল টান সাহিত্যের দিকে... আমি অনুভব করি এক জায়মান অন্য কিছু কে...।"৫

'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বেনামিতে প্রতিভা বসুর গল্প বেরোয়। সেখান থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। অন্যদিকে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর প্রকাশক সুবোধ মজুমদারের কাছ থেকেও তিনি রোমান্টিক উপন্যাস লেখার প্রস্তাব পান। বুদ্ধদেব বসুও তখন লেখিকাকে সে বিষয়ে লিখতে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠির সূত্র ধরেই তাঁদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই মধুরতা পরবর্তীতে তাঁদের পরিণয় সূত্রে বেঁধে দেয়। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সাথে সঙ্গীত শিল্পী রাণু সোমের বিবাহের পর বুদ্ধদেব বসুর লেখা সেই চিঠি প্রতিভা বসুর সাহিত্য জীবনে প্রবেশের প্রথম প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তাঁর হাত দিয়ে একে একে বেরোতে লাগলো 'মনোলীনা' (১৯৪৪), 'সেতুবন্ধ' (১৯৪৭), 'মনের ময়ূর' (১৯৫২), 'আলো আমার আলো', 'উজ্জ্বল উদ্ধার', 'সমাগত বসন্ত' ইত্যাদি উপন্যাস, 'মাধবীর জন্য' (১৯৪৪), 'প্রতিতু', 'গর্ভধারিণী', 'স্বপ্ন ভেঙে যায়', 'সুমিত্রার অপমৃত্যু' (১৯৩৯), 'ফ্রেম', 'ঘাস মাটি', 'সকালবেলা', 'স্বর্গের শেষ ধাপ', 'খন্ডকাব্য', 'সমুদ্র হৃদয়', 'সকালের সুর সায়াহ্নে', 'দ্বিতীয় নক্ষত্র', 'প্রথম সিঁড়ি', 'মধ্য রাতের তারা', 'ভালোবাসার জন্ম', 'ঈশ্বর ও নারী', 'পথে হলো দেরী' ইত্যাদি। স্বামী বুদ্ধদেব বসুর প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'কবিতা ভবন'। এই 'কবিতা ভবন'-এর নাম অনুসারেই তাঁদের কলকাতার নাকতলার বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'কবিতা ভবন'। তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাসের পাশাপাশি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল: প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মহাভারতের মহারণ্যে', আত্মজীবনী' 'জীবনের জলছবি', স্মৃতিকথা--- 'ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে, ভ্রমণ কাহিনি- 'স্মৃতি সততই সুখের' ইত্যাদি। প্রতিভা বসুর উপন্যাস, গল্প নিয়ে অনেকগুলি বাংলা চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। এগুলির মধ্যে সুনীল মজুমদারের পরিচালনায় সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল 'মনের ময়ূর' (১৯৫২)। নায়ক-নায়িকার অভিনয়ে ছিলেন উত্তম কুমার ও ভারতী দেবী। 'অগ্রদূত'-এর পরিচালনায় 'পথে হল দেরি' গল্পটির চলচ্চিত্রায়ণ, উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত 'আলো আমার আলো',' অতল জলের আহ্বান'-এর মত বিখ্যাত ছায়াছবি। এছাড়াও তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস--- 'মাধবীর জন্য', 'মধ্য রাতের তারা' প্রভৃতি প্রায় তেরো -চৌদ্দটির মত গল্প-উপন্যাস সিনেমা হয়েছে।

প্রতিভা বসুর জনপ্রিয়তার কথা বুদ্ধদেব বসুর মত অনেকেই সগৌরবে স্বীকার করেছেন। বিশিষ্ট মনীষী শিবনারায়ণ রায় প্রতিভা বসু সম্পর্কে বলেছেন----

> "প্রতিভা স্পষ্টতই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, প্রেম-অপ্রেম, লোভ ও ত্যাগ, করুণা ও বিদ্বেষ, প্রাপ্তি এবং ব্যর্থতা-এ সবেরই কৌতুহলী এবং তন্নিষ্ট শিল্পী।..... বুদ্ধদেবের চাইতে উপার্জন বেশি ছিল- হয়তো তাঁর লেখার জনপ্রিয়তাও একটি কারণ।"৬

সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন। লীলা মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, জগত্তারিণী গোল্ড মেডেল ইত্যাদি প্রতিভা বসুকে করে তুলেছিল আরো বেশি প্রানোজ্জ্বল। বুদ্ধদেবের বৃত্তকে ছাড়িয়ে নিজের একটা নতুন বৃত্ত সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। সবটাই ছিল তাঁর একার----

> "শুধু সাহিত্যিকরাই নন, এই বৃত্তের মধ্যে ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক, সিনেমার নায়ক নায়িকা, গানের জগতের মানুষ, সাধারণ পাশের বাড়ির বৌ, নিজের ভাইঝিরা, আশ্রিত ছেলেমেয়েরা সাধের কুকুররা আরও কত কে?"৭

নিজস্ব মাধুর্য দিয়ে সকলকে কাছে টেনে নিয়েছেন। এমনকি 'কবিতা' পত্রিকার লেখক অরুণ সরকার একটি কবিতা প্রতিভা বসুকে উৎসর্গও করেছিলেন।

১৯৬২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর প্রতিভা বসুর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি- কান্না, আনন্দ-বেদনা ও বঞ্চনা প্রাপ্তির এক বিচিত্র সমাবেশ লক্ষ্যনীয়। ১৯৬৩- ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় ছিলেন। ফিরে এসে ১৯৬৬ তে তাঁরা ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ছেড়ে সপরিবারে নাকতলার নিজস্ব বাড়িতে যান। বড় মেয়ে মিমির বিবাহ হয় সহপাঠী জ্যোতির্ময় দত্তের সাথে। ছোট মেয়ে রুমিও তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে আমেরিকায় গবেষণা করছেন। একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন। পুরো পরিবার নিয়ে তাঁর বাড়িটি তখন যেন ছিল একেবারে চাঁদের হাট। জীবন বৃত্তের অর্ধেক সফর খুবই আনন্দে অতিবাহিত হয়েছিল সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর। কিন্তু বাকি অর্ধেক সফর ছিল খুবই যন্ত্রণাময়। তাদের একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল বসু খুব অল্প বয়সে মারা যান। শুদ্ধশীল বসুর মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ঘুমের ইজেকশনেও ঘুম পাড়ানো যায়নি সন্তান হারা মা কে। জীবনমুখী প্রতিভা বসু ১৯৭২ সালে চলনশক্তি হারান। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। ফিজিওথেরাপিস্ট এস.কে ব্যানার্জি আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু আশানুরূপ কিছুই হয়নি। চারিদিকে বিপুল খরচ, সংসারের চাপ, অর্থোপার্জনের দুশ্চিন্তা, প্রিয়তমার এই অবস্থা দেখে মনে মনে ভেঙে পড়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। মৃত্যুচেতনা যেন ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। অবশেষে চিরবিদায় নিলেন বুদ্ধদেব বসু। প্রতিভা বসুকে স্বামী বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর খবর না দিয়ে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখা হয়েছিল তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে। 'জীবনের জলছবি'-তে তিনি লিখেছেন ----

> "সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, আলো-আঁধার সবই পাশাপাশি চলে। কিন্তু আমার জীবনে বুদ্ধদেবের চলে যাওয়াটা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গেল। দুঃখের উপর দুঃখ চেপে রইল শক্ত হয়ে।"৮

মনের সাহসের বিচারে প্রতিভা বসু ছিলেন অদ্বিতীয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর একা একা সঙ্গে সেবিকা নিয়ে বেড়িয়েছেন। দীঘা, কলকাতা থেকে ধানবাদ, সেখান থেকে কাশী, কানপুর, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি, আবার সোজা হরিদ্বার হৃষিকেশ। শোকের বন্যা তাঁর উপর দিয়ে বয়ে গেলেও অসীম সাহসিকতা, মনের জোর দেখিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়---

> "আমি অনুভব করলাম আমার বুকের ভিতর থেকে কে যেন উপরে টেনে ছিঁড়ে আমার হৃদপিণ্ডটা খসিয়ে নিল। আমি জানলাম পৃথিবীতে দৈহিক এবং মানসিক যত দুঃখ বেদনা অপমান, লাঞ্ছনা, এমনকি প্রিয়জনের মৃত্যুশোকই হোক না কেন, সন্তান বিয়োগের সমতুল্য কিছুই নয় এবং মানুষের সহ্যশক্তি অপরিসীম। তা না হলে আমার মৃত্যু হল না কেন?"৯

সময় যেমন কারোর জন্য থেমে থাকে না, তেমনি জীবনও প্রবাহিত। তাঁর সৃষ্টিশীল দীর্ঘ জীবনে তাঁকে নানা অশ্রুপিচ্ছিল বন্ধুর পথ ঘিরেছে, কিন্তু অতিক্রম করে এগিয়েও গেছেন তিনি। মানসিক দৃঢ়তা ও জীবনমুখী ভাবনার জন্য এমনকি ভেঙে না পড়ে শক্ত হাতে জীবনের হাল ধরে আবার কলম ধরেছেন তিনি। 'জীবনের

জলছবি', 'স্মৃতি সততই সুখের', 'মহাভারতের মহারণ্যে'-র মত অমূল্য শিল্প সম্পদ উপহার দিয়েছেন আমাদের। শেষ জীবনের কথা তিনি লিখেছেন ---

> "সবই তো সত্য তবু কেন রাতের অন্ধকারে, দিনের স্তব্ধ প্রহরে, কালো হয়ে আসা সন্ধ্যার বিমর্ষ বেলায় যে নেই সে এসে দাঁড়ায়, আমার কাছে, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এ থেকে মৃত্যু ছাড়া মুক্তি নেই জানি, শুধু জানি না সেই মৃত্যু আমাকে কবে দয়া করবে।"১০

এমনকি ১০তম জন্মদিনে 'জীবনের জলছবি'র পরও আরও বড় করে আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে নাম দিতে চেয়েছিলেন 'জীবন যমুনা'। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হল না। ১৩ অক্টোবর ২০০৬ উজ্জ্বল আকাশকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। সুরেলা সেতারের একটা তার যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল। বুক ভরা যন্ত্রণা নিয়েও তাঁর সৃষ্টির দুয়ার রুদ্ধ করেননি তিনি। মৃত্যুতে তো সৃষ্টি থেমে থাকে না। জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি চলে। জীবনের মত মৃত্যুও সত্যি। তাই মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিগত মৃত্যু শোককে বিশ্বের সৃষ্টিতে মিলিয়ে দেখতে পারলেই মনের মুক্তি সম্ভব। এই ধ্রুব সত্যিকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৩ সালে তাঁর পূজা পর্যায়ের গানে তুলে ধরেছেন----

> "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।"

১৩৩৯ সালের ২২ শ্রাবণ (৮আগষ্ট, ১৯৩২) কবিগুরু তাঁর ছোট মেয়ে মীরার পুত্র 'নিতু' (নীতিন্দ্র)-র মত্যুসংবাদ পান। এই দিনই তিনি 'বিথীকা' কাব্যের অন্তর্গত 'মাতা' কবিতাটি লেখেন। একজন সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ তাঁর অনুভূতিতে মিশে যায়। তিনি লেখেন----

> "বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন;
> আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন।
> জননীর এ বেদনা, বিশ্ব ধরনীর
> সে যে আপনার ধন
> না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।"

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থটি নিতু (নীতিন্দ্র)-কে উৎসর্গ করেছেন। নীতিন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে ১১ভাদ্র 'পুনশ্চ'-র 'বিশ্বশোক' কবিতাটি রচনা করলেন। শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত 'চিঠি পত্র'-র ৪ সংখ্যক পত্রটিতে আমরা দেখি ১২ ভাদ্র কন্যা মীরা দেবীকে তিনি লিখেছেন- 'শমী যে রাত্রে চলে গেল তারপরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলাম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বলল কম পড়েনি-সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। ... যা ঘটেছে, তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না হয়।' রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত শোকে কাতর না হয়ে তাকে জগৎ ও জীবনের বিরাট ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছেন। 'বিশ্বশোক' কবিতায় সেই সত্যকেই আমাদের উপলব্ধি করিয়েছেন....

> "এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনই
> তখনই সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।"

রবীন্দ্র স্নেহধন্য রানু সোমের জীবনানুভুতিতে রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের প্রভাব পড়েছিল নিশ্চয়ই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনার সাথে কোথায় যেন সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর মৃত্যু চেতনার সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

অন্যদিকে, নজরুল ইসলামের মৃত্যু চেতনার সাথেও নজরুল স্নেহধন্য প্রতিভা বসুর মৃত্যু চেতনার মিল খুঁজে পাই আমরা। ১৯৩০ সালের ৭ মে নজরুলের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুল গুটিবসন্ত রোগে মারা যায়। তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের ভালো নাম রেখেছিলেন অরিন্দম খালেদ। মৃত্যুর আগে পিতাকে কাছ ছাড়া হতে দেননি বুলবুল। তাই চোখের সামনে বসে বুলবুলের মৃত্যুকে দেখতে হয়েছিল কবিকে। বুলবুলের মৃত্যু কবির জীবনকে পুরো পাল্টে দিয়েছিল। সমস্ত উচ্ছ্বাস বর্জন করে তিনি আধ্যাত্ব সাধনায় মন দেন। এই সাধনার মধ্য

দিয়েই তিনি পরম শান্তিকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পুত্রশোক ভোলার জন্য হাস্যরসের মোরা 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যের কবিতাগুলো লেখা শুরু করেন। বুলবুল যখন রোগ শয্যায়, তখন বুলবুলের মাথার কাছে বসে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'- এর অনুবাদ শুরু করেন। ওই বছর জুলাই মাসে তা প্রকাশিত হয়। বইটি তিনি তাঁর বুলবুলকে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেলেন-- 'বুলবুল ই সিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ সেকি বুলবুলিস্তান? ইরানের চেয়েও সুন্দর? জানি না তুমি কোথায়? যে লোকেই থাকো, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন বলে গ্রহণ করো।' কিন্তু সন্তান শোক কি ভোলা যায়? তিনি এই শোককে ভুলতে নিজেকে সাহিত্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র সত্তা প্রিয় পুত্রকে ফিরে পেতে চেয়েছে। সমস্ত যন্ত্রণা আর্তি উজাড় করে দিয়ে তিনি লিখলেন-' শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়, ফিরে আয়!'

সাহিত্যিক প্রতিভা বসু জীবনের বাঁকে বাঁকে জীবনের মূল্যকে দু'হাত পেতে গ্রহণ করেছেন এবং পাঠকগনকেও তার স্বাদ গ্রহণ করিয়ে আপ্লুত করেছেন। জীবনের পাঠশালাতে তাঁর কাছ থেকে যেমন অনেককিছু শেখার সুযোগ আছে, তেমনি জীবনে চলার পথের নানান দিকের হদিশও আমরা পাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। ব্যক্তিগত জীবনের ভালো- মন্দ, শোক-আনন্দ, চাওয়া-পাওয়া, অভিজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতা, ক্ষোভ-প্রতিবাদ ইত্যাদি সবকিছুই অত্যন্ত সততা ও সরলতার সঙ্গে উজার করে যেন জীবনের জলছবি এঁকেছেন।

তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা যেমন 'জীবনের জলছবি'-তে ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর জীবন ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপ যদি আমরা খুঁজতে যাই, তাহলে দুই খন্ডে রচিত 'স্মৃতি সততই সুখের'-শীর্ষক গ্রন্থের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হবে। একটি ভ্রমণ কাহিনি কেবল দ্রষ্টব্যের বর্ণনায় দৃষ্টি সর্বস্ব হয়ে না থেকে পাঠকের মনজগতেও প্রবেশ করে তাঁদের বিশ্বপরিভ্রমনে নিয়ে যায়। তাঁর এই ভ্রমণকাহিনিমূলক আত্মস্মৃতি শুধু তাঁর জীবন ভূখণ্ডে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দেশ, কাল, সময়ের ইতিহাস রূপে। তিনি সহজ, সরল সুরে একেবারে নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত ভাবে যে জীবনকাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন, তা বাংলা ও বাঙালির একটি বিশেষ যুগকে চিত্রায়িত করে; যার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব বসু আমন্ত্রণ পান নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে, সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বক্তৃতা দেওয়ারও। সহধর্মিনী প্রতিভা বসু ছিলেন পথের সাথী। সারা পৃথিবী ভ্রমণের সুযোগ ঘটে লেখিকার। ভ্রমণজনিত সুখস্মৃতি তিনি হৃদয়গ্রাহী করে পাঠকদের অনুভব করিয়েছেন তাঁর' স্মৃতি সততই সুখের' গ্রন্থের দুটি খন্ডে। 'রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড'-এ টিকিট ছিল দু'জনের। পূর্বতট হয়ে যাওয়া, পশ্চিম তট হয়ে ফেরা। যাত্রাপথের প্রথমে ব্রহ্মদেশ হয়ে তারপর হংকং, জাপান, হাওয়াইদ্বীপ, হনুলুলু, সানফ্রান্সিসকো হয়ে নিউইয়র্ক পৌঁছানো এমনকি বেশ কিছুদিন মার্কিনে কাটানোর পর লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে থেকে শুরু করে প্যারিস, গ্লাসগো, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইটালি, রোম, গ্রীস, এথেন্স, মিশর, কায়রো ইত্যাদি ভ্রমণের পর কলকাতায় ফেরা-ঠিক যেন মানচিত্র। তিনি যাত্রাপথের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পরিচিত মানুষের পরিচয়, এলাকার সামগ্রিক চিত্র ও জনজীবনের পরিচয় প্রভৃতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির রসে জারিত করে, তাঁর নিজস্ব আনন্দ-বেদনার অনুভবকে সর্বজনীন করে তুলেছেন।

প্রতিভা বসুর স্বপ্নের দেশ বার্মায় পৌঁছে তিনি সেখানকার রঙিন ছবি দেখে খুবই মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়েছিলেন। বর্মী রেস্তোরাঁয় নৈশ ভোজন, প্যাগোডা দর্শন, ধনী ব্যক্তির বাড়ি আতিথ্য বরণ ইত্যাদি থেকেই সুন্দরভাবে বাঙালি পাঠক ওখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পায়। প্যাগোডার বর্ণনা পাঠক মনে এক নির্মল প্রশান্তি প্রদান করে----

> "প্রথমে প্যাগোডায় যাই, ... উঁচুতে উঠে মালভূমির মতো সমতল আঙিনায় সুউচ্চ মন্দিরে গাঢ়ভাবে সোনার জল করা চূড়াটি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কাছে কারুকার্য খচিত দরজার বৃহৎ পাল্লাটি অর্ধ উন্মুক্ত ছিলো। ভিতর থেকে একটা মদির গন্ধের ঝাপটা এসে মনটাকে পবিত্রতায় ভরে দিল। .....একজন সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন .....আমি ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলাম। ঘং ঘং করে ড্রামের গম্ভীর নিনাদে ভরে গেল পাহাড়। সন্ন্যাসীরা মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন। হৃদয় মন ক্ষণিকের জন্য পরম সত্তায় বিলীন হলো।"১১

এরপর বার্মা ছাড়িয়ে হংকং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে বিমানে বসে 'নিস্তরঙ্গ চাদরের মতো বিছানো' নিচে প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন জাপানে। তিনি জাপান দ্বীপের যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যি চমৎকার ও লালিত্যে পরিপূর্ণ। সেই সময় জাপানিরা আর্থিক পারমার্থিক কোনো ভাবেই পরমুখাপেক্ষী ছিল না। অগ্রগতিও ছিল অনেক। প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য কোনো দিক থেকে তারা পিছিয়ে ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর থেকে শুরু করে মাটির তলার রেল, উজ্জ্বল আলোকিত রেল স্টেশন, সস্তা ও সুন্দর জাপানি জিনিস, ঝকঝকে রাস্তাঘাট, অল্প জায়গায় কায়দা করে বানানো বাগান, জলাশয়, সেতুর বর্ণনা যেভাবে প্রতিভা বসু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন; তাতে মনে হয়েছে এগুলো যেন পশ্চিমি ইতিহাস।

জাপানের ওসাকা বিমানবন্দর, কিয়োটো শহরের কল্পনার ইন্দ্রপুরী মত বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ হোটেল থেকে শুরু করে ওবি পরিহিতা টসটসে আঙুরফলের মত টলটলে চামড়ার হাস্যমুখ পরির মত সুন্দরী মেয়েদের বারে বারে কাছে এসে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়নের প্রাজল বর্ণনা ঠিক যেন আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। জানা-অজানা পুরানো জাপানকে জানার প্রকৃষ্ট নমুনা বারবনিতা গেইসারা। লেখিকার স্মৃতি কথায় উঠে আসে হরিপ্রভা মল্লিকের কথা। হরিপ্রভা চারবার জাপানে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাসবিহারী বসু ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। নেতাজীর অনুরোধে টোকিও থেকে নিয়মিত আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে রেডিও মাধ্যমে প্রচার চালাতেন হরিপ্রভা দেবী। একজন জাপানি বধুর সামাজিক অবস্থান কতখানি মর্যাদার ও নিরাপত্তার তা দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ---

> "মেয়েদের পতি, পতির আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা পরম ধর্ম। ইহার কোনো রূপ অন্যথা হইলে স্ত্রী অত্যন্ত লাঞ্ছিতা হন। এমনকি শাশুড়ির অপছন্দ হলে স্বামী অনায়াসে স্ত্রী পরিত্যাগ করতে পারেন।"১২

স্ত্রী পরিত্যাগ ও পুনর্বিবাহ প্রথার প্রচলন থাকলেও সচরাচর একাধিক বিবাহ করেন না জাপানি পুরুষেরা মেয়েদের অবরোধ প্রথা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একসঙ্গে কাজ করতেন। প্রতিভা তা বসু এই হরিপ্রভার স্মৃতিচারণা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। কুনিশি ও ওবারার তৈরি জাপানের শান্তিনিকেতনের বর্ণনা, জাপানি সরাইখানার অপূর্ব সুন্দর বিবরণ, ফুজিয়ামার গরম জলে স্নান, কাবুকি নাটকের বর্ণনা সত্যিই আমাদের অবাক করে দেয়। সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও রুচির প্রতিযোগিতায় জাপান যে কত অগ্রগণ্য এবং কত যে ভূবন বিখ্যাত; আত্মজীবনীকার প্রতিভা বসুর গ্রন্থে তা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।টোকিওর পর হনুলুলুর বর্ণনা অসাধারণ ভাবে স্মৃতিচারণা করেছেন। এখানে লেখিকা ব্যক্তিগত স্মৃতির সাথে দ্বীপের বর্ণনা দিয়ে ভ্রমণকাহিনির রসসমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। মেয়েদের চেহারা ও পোশাক- আশাকের বর্ণনা, ইন্টারন্যাশনাল ডেডলাইন পার হওয়ার বিস্ময়কর অনুভূতি সত্যিই রোমাঞ্চকর। সানফ্রান্সিসকো, নিউইয়র্ক ভ্রমণের অনুভূতি অসাধারণ ভাবে বর্ণিত হয়েছে লেখিকার স্মৃতিকথায়। বসু দম্পতি নিউইয়র্ক এর আইডেল ওয়াইল্ড (এখন কেনেডি) বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে তুষারাবৃত শহরকে যেভাবে দেখেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা ----

> "সারা শহর তুষারাবৃত। খুব সন্তর্পনে গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার। ভয় পাচ্ছিল পাছে হড়কে যায়। আলোগুলোর উপরেও বরফের মোটা আস্তরণ। যে সব জায়গা শহরের হৃৎপিণ্ড..., বিশ তলা, ত্রিশ তলা, ... অজস্র আলোর ফোঁটাগুলোকে মনে হয় যেন রহস্যময় গ্রহের সব জাদুকরের বাড়ি" ১৩

পৃথিবীর এই বিশাল নগরটির চেহারা পথিকের মনহরণে সর্বদাই সক্ষম।

এইটথ এভিনিউয়ের তেইশ নম্বর স্ট্রিটে বহু শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্মৃতি জড়িয়ে থাকা হোটেলে থেকে ছিলেন বসু দম্পতি। বিশেষত এডগার লি মাস্টার্স দীর্ঘদিন এই হোটেলে কাটান এবং টমাস উলফের প্রথম উপন্যাস এই হোটেলে বসে লেখা। ফ্রান্স জোশেফ নামে বিখ্যাত আইনজীবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তাঁদের। মনেস্টারি, গোগেনহাম, ফ্রিকস মিউজিয়াম, অবস্কিওরড মিউজিয়াম ইত্যাদি সবই দেখেছিলেন বন্ধু জোসেফ এর সঙ্গে ---
-

> "অরিজিনেল ছবির এমন সংগ্রহশালা দর্শন জীবনে এই প্রথম। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। .... আমার বই পড়ার নেশা আছে, গান শোনারও শখ আছে, কিন্তু ছবির বিষয়ে বলা যায় প্রায় অজ্ঞান তিমিরে। এই ফ্রীকস মিউজিয়াম আমাকে দীক্ষিত করলো।"১৪

এছাড়াও মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়ামের রদ্যাঁর ভাস্কর্য থেকে শুরু করে 'চিন্তিত পুরুষ', 'চিরন্তন প্রেম', 'সমুদ্রসৈকত', 'বিধাতার হাত', 'বৃদ্ধা বেশ্যা', 'শয্যায় প্রেমিক যুগল', 'ভাইবোন' প্রভৃতি আসল ছবির রুপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। সজীবতার, স্বাভাবিকতার ও বাস্তবতার এক পূর্ণ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বর্ননায়; যা পাঠককে আপ্লুত করে।

'স্মৃতি সততই সুখের' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন মধ্যযুগীয় মনাস্টেরির, খিলানে শ্বেতপাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য, মধ্যযুগীয় জীবন ইত্যাদি সব কিছুই লেখিকাকে স্তম্ভিত করেছে। আখরোট কাঠের এমন হালকা লতাপাতা, ফুল, পাখি তৈরি হতে পারে তা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। নিউইয়র্কের রেডিও অফিসের লোক এসে ভারতীয় বাঙালি গৃহিণী সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর সাক্ষাৎকার নেন। ডক্টর অ্যালেনের ভারত প্রীতির কথা, ভারতকে শ্রদ্ধা করার কথা, ভারতীয় পদ্ধতিতে ঘরবাড়ি সাজানো 'গীতাঞ্জলি', টেবিল, রাজস্থানী ঝুলা, কাশ্মিরী কার্পেট, ভারতীয় পুতুল, সব দিয়ে পরিপূর্ণ অ্যালেনের সংগ্রহশালা ইত্যাদির বর্ণনায় প্রতিভা বসুর এই গ্রন্থ শুধু দেশ নয়, কাল-কেও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছে- এ যেন এক ঐতিহাসিক দলিল।

সেই সময়ে রোমে বসবাসরত বাংলার বিখ্যাত কবি শামসুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি প্রতিভার কাছে পূর্ব বাংলায় ঢাকের বাদ্য শুনে আশ্বিন মাসে ঘুম ভাঙার কথা, সন্ধ্যাবেলা শঙ্খ বাজানো এসবকে পুনরায় ফিরে পেতে চেয়ে আক্ষেপ করেছিলেন।শামসুরের এই আক্ষেপে পূর্ববাংলার মেয়ে প্রতিভা বসুও আবেগতাড়িত হয়েছিলেন। তাঁর মতে সমষ্টিগত জীবন তো রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলির পাঁঠা হয়ে আছে। বেদনা তাদেরও আছে, আমাদেরও আছে। কিন্তু আমরা সবাই ব্যক্তি মাত্র। আর কিছুই নয়। তিনি রহমান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন----

> "সেই জন্যই তোর দূর বিদেশে এসে মেলা দরকার। নইলে আপনজন চেনা যাবে কেমন করে? দেশে আমরা ভারতীয় আর পাকিস্থানী। বিদেশে তো আমরা শুধু বাঙালিই।"১৫

দেশভাগকে যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তার প্রমাণ এটি। অন্যান্য হৃদয়গ্রাহী বাঙালির কত দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রতিভা বসুর লেখনি থেকে জানতে পারি স্পষ্টরূপে হনলুলুর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, জাপানের শীতের কামড়ের কথা। বলেছেন নিউইয়র্কে তিনটি ঋতুই প্রধান আর মেঘ-বৃষ্টি সব ঋতুরই সথা। প্রতিভা বসু তাঁর গ্রন্থে তাঁর দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনার পাশপাশি আবহাওয়া থেকে শুরু করে সেখানকার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ ব্যবস্থা; এমনকি পরিবহন ব্যবস্থারও বর্ননা দিয়েছেন আন্তরিক ভাবে। যেমন:মাটির তলার ট্রেন,মাটির উপরের রেলস্টেশন এবং বাস স্টেশন ইত্যাদি।

নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার রঙে অত্যন্ত সহজ ভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন পশ্চিমী জায়গাকে।নারীদের পদানত করতে কেউই ছাড়েনি, সে সভ্য হোক বা অসভ্য জাতি হোক। তাঁর চেতনার সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে এইগুলি দেখে। আবার জাপানের মেয়েদের সামাজিক অবস্থান দেখে আনন্দও প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে সারাবিশ্ব উত্তাল তার প্রমাণ পাই লেখিকার বর্ণনার মধ্যে। জাপানে টোকিও থেকে ওকাহোমা পেরিয়ে মাচিদা সিটিতে 'টামাগাওয়াগা কোনেন' বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিভা বসুরা যান। সেখানে দেখেন আচার্য কুনিশি ওবারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো রবীন্দ্র আদর্শে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন গড়েছেন। বিদেশ ভ্রমণের নানাবিধ বর্ণনার কথা, অভিজ্ঞতার কথা, উপলব্ধির কথার সঙ্গে অনেক স্থানে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর রচনার মধ্য দিয়েই জানতে পারলাম জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ, প্যারিসের মানুষজন, ঘরবাড়ি, ভূ-প্রকৃতির কথা। শুধু তাই নয়, মৌলিক চিন্তা ভাবনাকে মিশিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে করে তুলেছেন একেবারে ভিন্ন স্বাদের।

আমরা জানি যে, যেকোনো ভ্রমণকাহিনি সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে লেখকের তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা, জীবন ও সমাজ দর্শন, নিজস্ব ভাবনা, সৌন্দর্যবোধ ও পর্যবেক্ষণের বিষয়ের উপস্থাপনার গুনে। বাংলা সাহিত্যে যেসকল ভ্রমণ কাহিনি সহজ সরল ভাষায় সর্বজনবোধ্য হয়ে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৭৮), 'পথের সঞ্চয়' (১৯১৩), 'জাপান যাত্রী' (১৯১৬), 'জাভা যাত্রীর পত্র' (১৯২৭) ও 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০), জলধর সেন রচিত 'হিমালয়' (১৯০০), সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'দেশে বিদেশে', 'জলে ও ডাঙায়', বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'অভিযাত্রিক', জসীমউদ্দীন রচিত 'চলে মুসাফির', 'যে দেশে মানুষ বড়', অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত 'পথে প্রবাসে', স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'পরিব্রাজক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মস্কোতে কয়েক দিন', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পালামৌ', রাহুল সাংকৃত্যায়ন রচিত 'ভলগা থেকে গঙ্গা', এস ওয়াজেদ আলী রচিত 'মোটর যোগে রাঁচি সফর', বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার (যাযাবর) রচিত 'দৃষ্টিপাত', ডঃ মুহাম্মদ এনামূল হক রচিত 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ', নির্মলেন্দু গুণ রচিত 'গীনসবার্গের সঙ্গে' ও 'ভলগার তীরে', মহম্মদ আব্দুল হাই রচিত 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' ইত্যাদি। সেই দিক থেকে বিচার করলে, সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর 'স্মৃতি সততই সুখের' গ্রন্থটি ভ্রমণ কাহিনির সীমা উত্তীর্ণ করে নিঃসন্দেহে উচ্চমানের ভ্রমণসাহিত্য সূচীর অন্তর্গত হওয়ার দাবী রাখে। তাঁর এই গ্রন্থ শিল্প সমন্বিত, জীবন স্পন্দনে স্পন্দিত; যা নিঃসন্দেহে ভারত তথা জগত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' (১৯৯৭) শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য।এর আগে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থে 'মহাভারত'কে মহারণ্যের সাথে তুলনা করেছেন।'মহাভারত'-এর আখ্যানে ধর্ম ও স্বধর্মের দ্বন্দ্ব খুঁজেছেন। ৮২ বছর বয়সে পৌঁছে প্রতিভা বসু 'মহাভারতের মহারণ্যে'রচনাতে বুদ্ধদেবের যুক্তিকে খণ্ডন করলেন। স্বামীর অনুসারী হয়ে না থেকে তিনি অনার্য কালো মেয়েদের পাশেদাঁড়ালেন। তাঁর যুক্তিতে 'মহাভারত' আসলে অনার্য কালো মেয়েদের জয়ী হওয়ার কাহিনি। ধীবর কন্যা সত্যবর্তী সেখানে নিজের পুত্র ব্যাসদেবকে দিয়ে পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করান। এরকমই এক গর্ভজাত সন্তান হলেন দ্রৌপদী। বিদুরকে তিনি মনে করেছেন যুধিষ্টিরের পিতা। কৃষ্ণ হলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একজন কপট চরিত্র। তিনি এখানে পান্ডবদের সততা ও জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি 'মহাভারত'-কে মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখেছেন, একজন ফেমিনিস্টের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। 'মহাভারত'-এর সাহিত্য গুনগান না গেয়ে নির্দ্বিধায় বাস্তব সত্যটাকে অনায়াসে খুব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলে গেছেন---

> "মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটে বিধৃত এক অনস্বীকার্য কালো- সাদার দ্বন্দ্ব। সংঘাত বৈধ-অবৈধের, আর্য-অনার্যের। লক্ষনীয় যে, ভারতবর্ষে আজও জাতিভেদ প্রবল, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ গাত্রবর্ণে প্রতিফলিত, সেখানে ক্ষত্রিয় কুলের এই কাহিনীতে কৃষ্ণবর্ণের আধিপত্য সর্বত্র, অবৈধ অনার্য এবং মিশ্র রক্তের জয়জয়কার, শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ শোণিতর চূড়ান্ত পতন ও বিলুপ্তি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ- যার নাম 'ধর্মযুদ্ধ'- তা যে কতদূর অধর্মের যুপকাষ্টে বলি হতে পারে, কতো মিথ্যা প্রবঞ্চনা নিষ্ঠুরতা ছলনা বর্বরতা হীনতা কাপুরুষতার নিদর্শনে ভরা, তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয়। আর যখন দেখি প্রতিটি অধার্মিক আচরণ অন্যায় আঘাত মিথ্যাচার এবং শঠতা এসেছে পান্ডবপক্ষ থেকে, প্রধানত স্বয়ং কৃষ্ণের কপটতায় আসক্তিহেতু, তখন বোঝা যায় না যে কী ধর্মে আমাদের উদ্দীপ্ত করা মহাভারতের উদ্দেশ্য।"১৬

বিক্রমপুর পরগনার করে বঙ্গের খাল-বিল সম্বল মগ্ন গ্রাম থেকে গাজীপুর, মনিপুর ফার্ম, চুঁচুড়া আর এরপরই একরাশ পশ্চিমী দেশের স্থান নিউইয়র্ক, জাপান, হনলুলু, লন্ডন, হল্যান্ড ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন তা যেন একের পর এক উজ্জ্বল রঙিন জলছবি। ছোট্ট সঙ্গীত-শিল্পী রানু সোম থেকে প্রতিভাময়ী প্রতিভা বসুর লেখণী সত্তার বিকাশের যাত্রাপথের পুরোটাই সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের কাছে বিরল দৃষ্টান্ত। আত্মপ্রচারের মোহ বর্জন করে নির্লিপ্ত ভাবে যে কোন বিষয়কে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে । প্রতিভা বসু সমালোচক সেরিনা জাহান বলেছেন----

> "গত শতকের বাঙালির জীবনকথা বা কোনো বিখ্যাত বাঙালির জীবনী লিখতে গেলে প্রতিভা বসুর 'জীবনের জলছবি'র খোঁজ আমাদের করতেই হবে- সেই বিরাট জীবনগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলোর সন্ধানে, মুখোশ না পরা মুখের খোঁজে, অন্তরের হদিশে।"১৭

প্রতিভা বসু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে যেভাবে দেশ-কালের পটভূমিতে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তিনি অনায়াসেই সাহিত্য জগতে অমরত্বের অধিকারী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্রষ্টা জীবন এক ভিন্ন স্বাদের স্বাতন্ত্র্যতার ফসল।

আকর গ্রন্থঃ

১. প্রতিভা বসু, 'জীবনের জলছবি', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০।

২. প্রতিভা বসু, 'স্মৃতি সততই সুখের', অখণ্ড সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১।

৩. প্রতিভা বসু, 'ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে', স্মৃতিকথা, বিকল্প প্রকাশনী, ২০০০।

৪. প্রতিভা বসু, 'মহাভারতের মহারণ্যে', বিকল্প প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, নববর্ষ, ১৪০৪।

৫. প্রতিভা বসু, 'গল্প সমগ্র', দুই খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ, সংস্করণ, জৈষ্ঠ্য ১৪০৩।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', আনন্দ প্রকাশনা, সিগনেট প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৩৮১।

২. রেবা দাস, 'রবীন্দ্র গল্পে নারীর কথা', প্রথম প্রকাশ, বাইশে শ্রাবণ, ১৪১৯।

৩. অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, মাঘ, ১৪২২।

৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, নতুন পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮-২০০৯।

৫. সমীর সেনগুপ্ত, 'বুদ্ধদেব বসুর জীবন', বিকল্প প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৮।

৬. সুতপা ভট্টাচার্য, 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য', সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।

৭. প্রতিভা বসু, 'দশটি উপন্যাস', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন, ২০০৮।

৮. তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০১১।

তথ্যসূত্রঃ

১. জগৎ লাহা ও সেতু চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', বামা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০৫, পৃষ্ঠা-১২।

২. প্রতিভা বসু, 'স্মৃতি সততই সুখের', প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৬০।

৩. প্রতিভা বসু, 'জীবনের জলছবি', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০০, পৃষ্ঠা-১০।

৪. প্রতিভা বসু, 'রবীন্দ্রনাথের গান', 'ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে, বিকল্প প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১০০-১০১।

৫. সমীর সেনগুপ্ত, 'বুদ্ধদেব বসুর জীবন', দময়ন্তী সিংহ, বিকল্প প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৮০-৮১।

৬. অরূপ আচার্য (সম্পা:), 'একান্তর', শিবনারায়ণ রায়, 'মনস্বিনী প্রতিভা বসু', জানুয়ারি, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৭৪।

৭. প্রতিভা বসু, 'জীবনের জলছবি', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০০, পৃষ্ঠা-৩১৭।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৩২৩।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৮৫।

১০. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৮৯।

১১. প্রতিভা বসু, 'স্মৃতি সততই সুখের', প্রথম পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃষ্ঠা-২৪।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮-৪৯।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪।

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১১-৯২।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৬।

১৬. প্রতিভা বসু, 'মহাভারতের মহারণ্যে', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০০, পৃষ্ঠা-১৫-১৬।

১৭. সেরিনা জাহান, 'জীবনের ক্যানভাসে শিল্পীর প্রতিভায়', অরূপ আচার্য (সম্পাঃ), জানুয়ারি, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২০৮।